Working Paper

SPECIAL SERIES: CHANGING VILLAGE
NO. 69 ● JUNE 2025

গ্রাম পরিবর্তন
প্রেক্ষাপট ও গবেষণা কৌশল

তানভীর শাতিল
ড. শাহাদুজ্জামান

ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রাম পরিবর্তন

প্রেক্ষাপট ও গবেষণা কৌশল

তানভীর শাতিল, ড. শাহাদুজ্জামান

ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থস্বত্ব © BIGD

প্রকাশকাল: জুন ২০২৫

প্রকাশক: BIGD, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক: নুসরাত জাহান ও মাধুরী গোস্বামী

প্রচ্ছদ ও পরিকল্পনা: মো: আব্দুর রাজ্জাক

ISBN | 978-984-95752-1-4

ভূমিকা

ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (BIGD), ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ২০২৩ সালে গ্রামীণ সমাজকে পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বুঝতে একটি এথনোগ্রাফিক গবেষণা পরিচালনা করে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা অনুধাবন করেছি, ১৯৭০-৮০ দশকে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ নিয়ে পরিচালিত গবেষণাসমূহ যেসকল "চিরায়ত" সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যকে গ্রামের স্বতন্ত্রতা হিসাবে বিবেচনা করে এসেছে সেগুলোতে নানা মাত্রায়, বিভিন্ন দিক থেকে পরিবর্তন এসেছে। বিশেষত, কৃষিভিত্তিক জীবিকা ও আর্থ-সামাজিক কাঠামো, ভূমি মালিকানা ও জ্ঞাতিসম্পর্কভিত্তিক ক্ষমতা কাঠামো, পারিবারিক যৌথতা, যোগাযোগ ব্যবস্থায় পিছিয়ে থাকাসহ সাংস্কৃতিক নানা পরিসরকে বিবেচনায় রেখে গ্রামকে এতদিন যেভাবে চিত্রায়ণ করা হয়েছে সেই প্রচলিত ধারণাতেও পরিবর্তন এসেছে। গ্রামকে নগর কিংবা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার প্রেক্ষিত পাল্টেছে (পার্থ, ২০২৪); আমরা এখন বাজার অর্থনীতি আর বিশ্বায়নের যুগে বসবাস করছি।

আমাদের এই গবেষণায় গত ২৫ বছরে বাংলাদেশে পরিবর্তনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে কেননা আর্থ-সামাজিক ও মানব উন্নয়নের তথ্য উপাত্তে দেখা যায়, এই সময়কাল বিশেষত ২০০০ সাল থেকে ২০২৪-২৫ সাল পর্যন্ত এসকল উন্নয়ন সূচকে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে, যেমন বিশ্বব্যাংকের তথ্যানুযায়ী গত ২৩ বছর ধরে বাংলাদেশের জিডিপির গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.১ শতাংশ। আবার, বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচক (ইউএনডিপি-এর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স) ২০০০ সালে ছিল ০.৪৭৮, যা ২০২৩ সালে ০.৬৮৫ তে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া ২০০০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার কমেছে প্রায় ৩০.২ শতাংশ।

একই সময়ে, বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং ক্ষমতাকাঠামো উল্লেখযোগ্য ঘটনাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। যেমন—১৯৯৬ সালে চালু হওয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দ্বিতীয়বারের মত ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা নিয়ে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে জাতীয় রাজনীতিতে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়, যার ফলশ্রুতিতে ২০০৭ সালে সেনাশাসিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসে, এবং জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ব্যাপক

রদবদল লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীতে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর ৯ম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। ২০১৪ সালের নির্বাচনের পূর্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা রদ করা হয় এবং পরবর্তীতে দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন যথাক্রমে ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত হয় যেগুলো সুষ্ঠু নির্বাচনের মানদণ্ডে ব্যাপকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। এই প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের মধ্যদিয়ে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক শক্তি দীর্ঘ সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আঁকড়ে থাকে এবং সমাজের নানা স্তরে রাজনীতিকায়নের বিস্তার ঘটায়। যেমন—দেখা যায় ২০১৬ সালে তৎকালীন রাজনৈতিক সরকার স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোকে দলীয় ব্যানারে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দেয়। ফলে, রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের দলীয় প্রতিনিধি নির্ধারণের মাধ্যমে দলীয় প্রতীক নিয়ে স্থানীয় নির্বাচনে অংশ নেয়। এর ফলে স্থানীয় সরকার ও এর সেবাপ্রদান কাঠামোতে রাজনৈতিক বলয় বিস্তার লাভ করে যা স্থানীয় সরকারের কর্মকাণ্ডে দুর্বৃত্তায়নের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং স্থানীয় সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তির বিস্তার, ডিজিটালাইজেশনের প্রেক্ষাপটের বিষয়াদিকে বিবেচনায় রেখে গত ২৫ বছর সময়কাল আমাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। যদিও আমাদের গবেষণায় গত ২৫ বছরে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের ধারাকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তবুও দেখা যায় পরিবর্তনের এমন সকল প্রেক্ষিত (যেমন—অভ্যাস, বিশ্বাস প্রভৃতি) রয়েছে যেগুলো নিয়ে গ্রামের মানুষের বয়ান প্রায়শই নির্দিষ্ট সময়ের মাপকাঠিতে স্থির থাকেনি। সামগ্রিকভাবে দেখা যায় আমাদের গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের চারপাশের পরিবর্তনের ধারা ও নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে যে পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেন তার স্মৃতিচারণায় গত তিন-চার দশকের একটা চিত্র সামনে নিয়ে আসেন। ফলে একভাবে বলা যায়, গত ৩০-৪০ বছরে বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জলবায়ু, ভৌত অবকাঠামো, আর্থ-সামাজিক কাঠামো, ক্ষমতা কাঠামো থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক পরিসরের নানা ক্ষেত্রে যে ধরনের পরিবর্তন এসেছে তা আমরা এই নৃতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে উন্মোচনের চেষ্টা চালিয়েছি।

এই প্রেক্ষিতে আমাদের এই গবেষণা শুরুর দিকের অভিজ্ঞতা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে। আমরা যখন গবেষণা প্রস্তুতিকালীন মাঠকর্ম (পাইলটিং) করি তখন গ্রামের মানুষদের কাছে গ্রামের পরিবর্তন বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তারা মোটাদাগে কিছু সাধারণ (মূলত) দৃশ্যমান “উন্নয়নমূলক” পরিবর্তনকেই প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ জীবনের পরিবর্তন হিসেবে চিহ্নিত করেন। আমরা যখন মাঠ গবেষণাটি করেছি সেসময়ে বাংলাদেশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসন্ন, আর উন্নয়নের রাজনৈতিক উদযাপনের নানান শব্দমালা যেমন—ডিজিটাল বাংলাদেশ, স্মার্ট বাংলাদেশ, উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ ইত্যাদি জাতীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের বয়ানে যুক্ত হয়েছে। “সময়ের অনুনাদ (টেম্পোরালিটি)” হিসাবে জনমনে উন্নয়নের বয়ান প্রকট হয়ে থাকলেও গ্রামীণ মানুষ বহুমাত্রিক পরিবর্তন অনুধাবন করেন তাদের প্রাত্যহিক জীবন অতিবাহনের অভিজ্ঞতায়। আর সেই প্রেক্ষিতে গ্রামের পরিবর্তনকে বুঝার ক্ষেত্রে “উন্নয়নে”র একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করি। অনেকক্ষেত্রে এই উন্নয়নের প্রভাবে গ্রামে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে আবার অনেকক্ষেত্রে এই পরিবর্তন হয়েছে নেতিবাচক। এই গবেষণার ক্ষেত্রে পরিবর্তন বলতে শুধুমাত্র “উন্নয়নকে” না বুঝে, বরং আমরা গ্রামের

মানুষের সাথে কথা বলার মধ্য দিয়ে উন্নয়নকেন্দ্রিক ভাবনার বাইরেও তাদের অভিজ্ঞতায় পরিবর্তনের যে ধারণা সেটি বুঝার চেষ্টা করেছি।

বাংলাদেশের গ্রাম নিয়ে আগেও অনেক গবেষণা হয়েছে। সেই গবেষণাসমূহের প্রেক্ষিতে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাবো বর্তমানের বাংলাদেশে নানাবিধ মেগাপ্রকল্প, গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নগরের সাথে যুক্ততা এবং ডিজিটালাইজেশনের প্রভাবে গ্রামের অনেক পরিবর্তন হয়েছে (পার্থ, ২০২৪)। এই সকল দৃশ্যমান উন্নয়নমূলক পরিবর্তন গ্রামের প্রচলিত ধারণাকে, বিশেষত গ্রামকে নগরের সাথে বিচ্ছিন্ন করে দুর্গম আর পিছিয়ে পড়ার প্রেক্ষিত থেকে দেখার যে প্রবণতা, সেই বিষয়ে নতুন করে ভাববার তাগিদ দেয়।

এর পাশাপাশি গ্রামীণ মানুষের প্রাত্যহিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনে নানাবিধ পরিবর্তন এসেছে যার সবকিছু সবসময় দৃশ্যমান নয়। মানুষ তার জীবন অতিবাহনের প্রেক্ষিতে তা অনুধাবন করে থাকে। ফলে বর্তমান গ্রাম সম্পর্কে জানতে এবং গ্রামের পরিবর্তন এবং পরিবর্তনের পেছনে কারণগুলো সামগ্রিকভাবে বুঝতে গ্রাম গবেষণার গুরুত্ব আমাদের সামনে আসে।

প্রস্তুতিকালীন মাঠকর্মের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা গ্রামের সার্বিক পরিবর্তনকে মোটাদাগে সাতটি প্রেক্ষিত থেকে দেখার সিদ্ধান্ত নেই। আর এই পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটগুলো হল অভিবাসন, সংস্কৃতি, স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক স্তরবিন্যাস, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, মানবসৃষ্ট পরিবেশ (Built environment) ও কৃষি।

আমরা এই গ্রাম পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটগুলোর সাথে বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাব ও সম্পৃক্ততা দেখতে পাই, যা আমাদের বোঝাবুঝিকে নিবিড় করে তুলেছে। আমরা অনুধাবন করতে পারি, পরিবর্তন একটি চলমান বা ঘটমান (ডাইনামিক) বাস্তবতা এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতগুলো একে অপরের সাথে আন্তঃসম্পর্কিত, আর সে অনুযায়ী আমরা গ্রামের পরিবর্তনকে স্থানীয়দের বয়ানের ভিত্তিতে নিবিড়ভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করি।

বাংলাদেশের উন্নয়ন সাহিত্যে পরিবর্তনের সংখ্যাতাত্ত্বিক যে বয়ান তাতে গ্রামীণ মানুষের যাপিত জীবনের প্রাত্যহিকতার চিত্র প্রকটভাবে অনুপস্থিত আর সেটি আমাদের গবেষণার তাগিদ বাড়িয়েছে। আমরা মনে করি গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তনকে গ্রামীণ মানুষ তাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে কেমন অনুধাবন করেন—এই চিত্র অন্তর্ভুক্ত হলে উন্নয়নসাহিত্যে পরিবর্তনের বয়ান আরও সামগ্রিক ও গভীর হয়ে উঠবে।

উল্লেখ্য, আমাদের এই মাঠকর্ম থেকে আহরিত তথ্যের ভিত্তিতে সাতটি থিম নির্ধারণ করে প্রতিটি থিমকে কেন্দ্র করে পৃথক পৃথক অধ্যায় রচনা করা হয়েছে। যেহেতু পরিবর্তনের থিমগুলো একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত, সেক্ষেত্রে গবেষকগণ নিজেদের মাঝে বেশ কয়েকটা ওয়ার্কশপ করেন, যার মাধ্যমে তারা ধারণা বিনিময় ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে সমন্বিত করেন। খসড়া তৈরির পর সাতক্ষীরার তালা উপজেলার কুমিরা গ্রামে অবস্থিত বিআইজিডি'র মাঠকেন্দ্রে গবেষকদলের সাথে বাইরের বিশেষজ্ঞদের (এক্সটার্নাল রিভিউয়ার) অংশগ্রহণে দুইদিন ব্যাপী ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। এই ওয়ার্কশপটি

গবেষকদের নানাভাবে সহায়তা করেছে, বিশেষ করে আহরিত তথ্য গ্রামীণ প্রেক্ষিতে ক্রসচেক করার ক্ষেত্রে। ওয়ার্কশপের ভেন্যু হিসেবে গ্রামে অবস্থিত মাঠকেন্দ্র একটা বাড়তি মাত্রা যোগ করেছিল।

আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য করা প্রয়োজন, প্রাথমিকভাবে এই ৭টি থিম থেকে ৫টি (অভিবাসন, সংস্কৃতি, স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক স্তরবিন্যাস, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি) থিমের উপর বিআইজিডি ওয়ার্কিং পেপার প্রকাশিত হচ্ছে। এই লেখায় সামগ্রিক গবেষণার কৌশল ও গবেষিত গ্রামের সাধারণ তথ্য লিপিবদ্ধ করা হলে, যা সবগুলো থিমের জন্যই প্রযোজ্য। এই গবেষণা থেকে প্রকাশিত ওয়ার্কিং পেপারগুলোতে শুধুমাত্র থিমের সাথে সম্পর্কিত কৌশল ও তথ্য উল্লখ থাকছে।

গবেষণা কৌশল

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন বিষয়ক এই গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য হলো গত তিন দশকে গ্রামাঞ্চলে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের ধারাকে গ্রামীণ মানুষের প্রেক্ষিত থেকে এথনোগ্রাফিক গবেষণার ভেতর দিয়ে নিবিড়ভাবে বোঝা। সার্বিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিত হিসেবে আমরা মোটাদাগে ২৫-৩০ বছরকে বিবেচনায় রেখে বর্তমান সময়াবধি একটা সময়ের পরিক্রম বোঝার চেষ্টা করেছি। তবে, পরিবর্তনের পরিক্রমায় সকলের বোঝার সুবিধার্থে এই সময়কাল নির্ধারণে জাতীয় বা স্থানীয় কোনো বড় ঘটনার প্রেক্ষিতকে বিবেচনায় রেখে গ্রামের মানুষের সাথে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এক্ষেত্রে কয়েক বছর আগপিছ হয়েছে, যেমন ১৯৯৮ সালের দেশব্যাপি বন্যা একটি ঐতিহাসিক ল্যান্ডমার্ক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আবার, এই নতুন শতাব্দীতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে যার মধ্যে রয়েছে, ২০০৭-২০০৮ সালের সেনাশাসিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার, ২০০৮ এর জাতীয় নির্বাচনের পর থেকে নতুন ধরণের উন্নয়ন ধারাকে দেশের মধ্যে পরিচিত করানো, পেশার বৈচিত্র ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, ডিজিটালাইজেশনের বিস্তৃতি, ইত্যাদি জাতীয় পর্যায়ের বড় ঘটনা কিংবা স্থানীয় পর্যায়ে সর্বজনবিদিত কোন ঘটনাকে পরিবর্তনের সময়কাল নির্ধারণে ব্যবহার করা হয়েছে স্থানীয়দের স্মৃতিচারণের প্রেক্ষাপটে। গ্রামকে আগে যেভাবে বিচ্ছিন্ন, কৃষিভিত্তিক ইউনিট হিসেবে দেখা হতো, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে গ্রাম এখন অনেকটাই জাতীয়, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতের সাথে সংযুক্ত হয়ে উঠেছে। আবার কিছু বিষয়ে এখনো তার স্বাতন্ত্র টিকে আছে। তবে এসকল পরিবর্তনের একধরনের প্রবাহ রয়েছে, আর এই প্রবাহকে ধরেই পরিবর্তনের কিছু কিছু জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। আমাদের এই গবেষণায় সেরকম জায়গাগুলোকে সাতটি থিমে ভাগ করা হয়েছে যেমন—অভিবাসন, সংস্কৃতি, স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক স্তরবিন্যাস, আর্থিক অন্তর্ভূক্তি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, বিল্ট ইনভাইরনমেন্ট (Built environment) বা "মানবসৃষ্ট পরিবেশ", কৃষি। তবে এই থিমগুলো বিচ্ছিন্ন কিছু না, বরং আন্তঃসম্পর্কিত। এই থিমগুলো একে অন্যের সাথে যেমন সম্পর্কিত আবার নানাভাবে নানান প্রেক্ষিতে একে অন্যকে প্রভাবিতও করে। এই থিমগুলোতে পরিবর্তন সংগঠিত হওয়ার পেছনে কিছু ফ্যাক্টর কাজ করে যেগুলোকে আমরা পরিবর্তনের নিয়ামক বা ড্রাইভার হিসেবে চিহ্নিত করেছি। মূলত এই পরিবর্তনের থিমসমূহ এবং নিয়ামকের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়া বোঝার মধ্য

দিয়ে ঘটমান পরিবর্তনকে বোঝা হয়েছে। আমাদের গবেষণায় মূলত এই মিথস্ক্রিয়ার একটি সামগ্রিক রূপ মাঠকর্মের মাধ্যমে তুলে আনা হয়েছে।

গবেষণা এলাকা নির্ধারণ

এই গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিছু গ্রাম বাছাই করা হয়। এই গ্রামগুলো বাছাই করার সময়ে মাহবুব হোসেন প্যানাল ডাটা (এম এইচ পি ডি) সেট একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এম এইচ পি ডি মূলত দীর্ঘ সময় ধরে পাঁচ পর্যায়ে (১৯৮৭-৮৮, ১৯৯৯-০০, ২০০৩-০৪, ২০০৭-০৮, ২০১৩-১৪) বাংলাদেশের ৫৭টি জেলা থেকে ৬২টি গ্রামে জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে একীভূত খানাভিত্তিক সিরিজ তথ্যভাণ্ডার, যা বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে সর্বাধিক পুরোনো এবং দীর্ঘমেয়াদী (Longitudinal) খানাভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার হিসাবে স্বীকৃত (Malek, M. A. et al., 2022)। এই তথ্যভাণ্ডার আমাদের গবেষণায় গ্রাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, বিশেষত এখান থেকে গ্রামসমূহের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায় যেমন—কোন গ্রামে অভিবাসনের হার কেমন, জনতত্ত্ব, গ্রামের মানুষের পেশার ধরন, কৃষি উৎপাদন ও জমির ব্যবহারের ধরন, দুর্গমতা ইত্যাদি। এছাড়াও এই তথ্যভাণ্ডারের গ্রামসমূহের পরিবর্তনের ধরণ সম্বন্ধেও একটা ধারণা পাওয়া যায়।

সেই প্রেক্ষিত থেকে, প্রস্তুতিমূলক মাঠকর্ম পরিচালনা করার জন্য আমরা শুরুতে কিছু বৈশিষ্ট্যকে আমলে নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১০টি গ্রামকে বেছে নেই। প্রস্তুতিমূলক মাঠকর্মের পর আমরা আটটি গ্রামকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করি মূল গবেষণাটি পরিচালনা করার জন্য। এই গ্রামগুলোর মাঝে এম এইচ পি ডি তথ্যভাণ্ডারের বাইরের গ্রামকেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় মূলত ইউরোপে অভিবাসনের হার ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিত দুটিকে বিবেচনায় রেখে। গবেষণার আওতাভুক্ত গ্রামগুলো হলো—সুনামগঞ্জের পশ্চিম কাশিপুর, কুমিল্লার ভবানীপুর, কক্সবাজারের নয়াপাড়া, শরিয়তপুরের নলতা, জামালপুরের রামপুরা, খুলনার মাইলমারা, লালমনিহাটের আরাজি শেখসুন্দর, সাতক্ষীরার গোবিন্দকাঠি।

এই গ্রামগুলোর প্রত্যেকটিতেই নানাক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তনের পিছনে বিভিন্ন নিয়ামক কাজ করে। পরিবর্তনের ক্ষেত্রগুলোতে গ্রামভেদে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে সামনে এসেছে। আবার কিছু বিষয় সার্বজনীন অর্থাৎ সকল গ্রামের ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় যেমন, অভিবাসন, কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিকায়ণ, ডিজিটালাইজেশন, ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার প্রতিটা গ্রামের পরিবর্তনেই নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। আর এসব পরিবর্তনের প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে গ্রামীণ মানুষের সংস্কৃতির উপরেও পড়েছে। ফলে কিছু সাংস্কৃতিক চর্চা ও অনুষঙ্গ যেমন কালের পরিক্রমায় বিলুপ্ত হয়েছে বা বিলুপ্তির পথে আছে আবার অনেক নতুন চর্চা ও অনুষঙ্গ গ্রামীণ জীবনে প্রবেশও করেছে। আবার একইভাবে গ্রামের মানুষের বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনা, রীতি রেওয়াজ, চর্চা, মূল্যবোধ, পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

তথ্য সংগ্রহ

এই গবেষণায় এথনোগ্রাফিক মাঠকর্মের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় পরিবর্তনের যে স্থানিক অনুধাবন তা তুলে আনা হয়েছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, যদিও এথনোগ্রাফিক মাঠকর্মে সাধারণত বর্তমান সময়ের চিত্রায়নের দিকে গবেষকদের ঝোঁক থাকে, আমাদের এই মাঠকর্মে "বর্ণনামূলক অনুসন্ধানকে (narrative inquiry)" তথ্য সংগ্রহ কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে মানুষের যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতাসমূহকে স্মৃতিচারণমূলক আলাপের ভিতর দিয়ে তুলে আনা হয়েছে। বর্ণনামূলক অনুসন্ধানের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল গবেষক এবং গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপনের উপর জোর দেওয়া। এই পদ্ধতি এমন একটি পরিসর তৈরি করে যেখানে গবেষক এবং অংশগ্রহণকারী উভয়ের যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে আলাপ আগানোর সুযোগ থাকে। তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসেবে বর্ণনামূলক অনুসন্ধান অংশগ্রহণকারীদের গল্প এবং অভিজ্ঞতা গভীরভাবে বুঝতে সহায়তা করে এবং একটি সহযোগিতামূলক এবং ইন্টারেক্টিভ গবেষণা প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে (Clandinin, D. J., & Caine, V., 2013)|

আমাদের মাঠকর্মের কথোপকথনের ভেতর দিয়ে উঠে আসে গ্রামীণ মানুষের যাপিত জীবনের ব্যক্ত-অব্যক্ত অভিজ্ঞতা, জীবনযাপনের পদ্ধতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক শৃঙ্খলা, প্রযুক্তি, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, জীবনবোধ, জীবিকা, নস্টালজিয়া কিংবা প্রতিনিয়ত দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান বদলের সাথে নিজেদের মানিয়ে নেয়ার প্রেক্ষিতসমেত নানাবিধ দিক। সহজে বলা যায় বর্ণনামূলক অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই গবেষণায় জীবনের অভিজ্ঞতা বা গল্পগুলো নিবিড়ভাবে শুনতে ও বুঝতে চাওয়া হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, এই গবেষণার আওতাভুক্ত প্রতিটি গ্রাম থেকেই একজন স্থানীয় তরুণীকে গবেষণাদলে কমিউনিটি গবেষক হিসেবে যুক্ত করা হয়েছিল, যা স্থানিক প্রেক্ষাপট ভালোভাবে বুঝতে সহায়ক হয়েছে। প্রতিটি গ্রামে দুইজন পুরুষ গবেষক এবং একজন নারী কমিউনিটি গবেষক তিন মাস সময় নিয়ে এথনোগ্রাফিক পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের কাজ করেছেন।

তথ্য সংগ্রহ কৌশল

এই গবেষণায় প্রতিটি গ্রাম থেকে ধারাবাহিক তথ্য সংগ্রহের জন্য আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পেশা, অভিবাসন, কৃষি প্রভৃতি বৈচিত্রময়তার ভিত্তিতে ৬ টি খানা নির্ধারণ করা হয়েছিল, যেখানে চল্লিশোর্ধ্ব এক বা একাধিক সদস্য রয়েছেন। খানাতে চল্লিশোর্ধ্ব সদস্য থাকার বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় রাখার প্রধান কারণ ছিল আমাদের গবেষণার উদ্দেশ্য-সচেতনভাবে বিগত ২৫-৩০ বছরের তথা মোটাদাগে ৩-৪ দশকের পরিবর্তনের স্বরূপকে বোঝা। চল্লিশোর্ধ্ব সদস্য থাকার ফলে নির্বাচিত খানার অন্তত একজন ব্যক্তির গত ৩-৪ দশকের পরিবর্তনের গল্পকে সামনে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন তাঁর কৈশোরের স্মৃতি থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা বর্ণনার মধ্য দিয়ে।

গবেষণাকালীন সময়ে প্রতিটি খানায় গড়ে ৭-৮ বার যাওয়ার মধ্য দিয়ে অনুক্রমিক খানাভিত্তিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ একটি খানা থেকে একাধিক উত্তরদাতার সাথে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে কথা বলা হয়েছে। আমরা খানাকে তথ্য সংগ্রহের কেন্দ্রে রেখে অন্যান্য পদ্ধতি যেমন পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণকালীন কথাবার্তা, নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত স্থানীয় অংশীজনদের থেকে নির্বাচিত প্রধান তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, অনানুষ্ঠানিক নানান আলোচনা, প্রাসঙ্গিক ছবি সংগ্রহ, ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করেছি। তথ্য সংগ্রহের সময় আমাদের মাথায় সামগ্রিকভাবে ২৫-৩০ বছর সময়কালের বিষয়ভিত্তিক বদলের গল্প তুলে আনার প্রয়াস ছিল। এটা কোনোভাবেই শুধুমাত্র উন্নয়নের ধারাকে ইঙ্গিত করে না, বরং এই পরিবর্তন বা বদলের প্রেক্ষিতটিকে মোটাদাগে সাতটি থিমের মধ্য দিয়ে দেখা হয়েছে। যেমনঃ অভিবাসন থিম দিয়ে আমরা মূলত গ্রামের পরিবর্তনে অভিবাসনের ভূমিকা এই থিমের আওতায় দেখতে চেয়েছি। আবার দেখা যায়, আমরা পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন থিমকে মূলত মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে এর যে পরিবর্তনগুলো নিহিত সেগুলোকে গুরুত্বারোপ করেছি। এছাড়াও, গবেষকদল মানুষের কোন অভিজ্ঞতা বা আলোচনা কোন থিমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা বুঝে সে মতে আলোচনা এগিয়ে নিয়েছে। কীভাবে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি স্থানীয় গ্রামীণ ঘটনাকে প্রভাবিত করছে এবং নতুন আকার দিচ্ছে, গ্রামের প্রেক্ষাপটে তার নিজস্ব প্রকাশ রয়েছে-এই বিষয়গুলোকেও অনুধাবন করেছে।

উত্তরদাতাদের কাছ থেকে থিম অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি সেগুলোর সাথে সম্পৃক্ত বাস্তবতা ও প্রেক্ষাপটও তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো গ্রামে একটা বড় সড়ক তৈরি হওয়া একটি ভৌত অবকাঠামোগত পরিবর্তন। কিন্তু এই সড়কটি তাদের পেশা, অর্থনীতি, সংস্কৃতিসহ আরো নানান বিষয়কে প্রভাবিত করতে পারে। অর্থাৎ, কোন বিষয়কেই আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই তবে প্রত্যেকটি আলাদা থিমের গুরুত্ব রয়েছে যা মাঠকর্মের সময় সচেতনভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। পরিবর্তন কখনোই একরৈখিক নয়। কিছু পরিবর্তন দৃশ্যমান হয় আবার কিছু চোখে দেখা যায় না। দৃশ্যমান পরিবর্তনগুলোর কারণে অদৃশ্য পরিবর্তন ঘটতে পারে আবার বিপরীতভাবে অদৃশ্য পরিবর্তনের কারণেও দৃশ্যমান পরিবর্তন হতে পারে। প্রত্যেকটি থিমেই এরকম দুই ধরনের পরিবর্তনকে মিলিয়ে পরিবর্তনকে দেখা হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা

গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অনুধাবিত হয়েছে তা হলো "পরিবর্তন" এর একটা ফাংশনালিটি রয়েছে, আর এটি একরৈখিক নয়, বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, নয়াউদারনৈতিক (neoliberal) বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতি, প্রযুক্তি, ইত্যাদি নানান প্রেক্ষিতের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত এক মিথস্ক্রিয়া যা প্রতিনিয়ত ঘটমান বা ধাবমান। এই জটিল বাস্তবতার প্রেক্ষিতের সাথে যুক্ত হয় গবেষণাকর্মটির সক্ষমতার পরিসর থেকে বিস্তৃত গ্রাম সংস্কৃতির সুবিধাজনক পরিধি নির্ধারণ করা। তাই, প্রথমে কিছু দ্বিধা কাটিয়ে উঠা প্রয়োজন, আমরা আমাদের গবেষণার অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের

গ্রামগুলোর পরিবর্তন দেখতে চেয়েছি। আর এই পরিবর্তনের ফাংশনালিটির সামগ্রিক প্রেক্ষিত থেকে গ্রামীণ সমাজের নানান প্রেক্ষিত ও সংস্কৃতির পরিবর্তনকে দেখতে গেলে গবেষণার ব্যাপ্তি আরো বাড়ানো ব্যতীত উপায় থাকে না। মূলত গবেষণাকাল বৃদ্ধি করে, আরো সময় নিয়ে, নিবিড়ভাবে দেখা প্রয়োজন আছে। তাই আমাদের গবেষণালব্ধ তথ্যভাণ্ডার দিয়ে পরিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমাদের প্রস্তুতিকালীন ১ মাস আর মূল গবেষণা পরিচালনার ৩-৪ মাসের মাঠকর্ম থেকে গ্রামীণ সমাজে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক নানান প্রেক্ষিতের মিথষ্ক্রিয়ায় পরিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর দুঃসাহস আমরা এই গবেষণায় করছি না। তাই নিজেদের গবেষণার সীমাবদ্ধতাকে মাথায় রেখে, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে যে পরিবর্তন মানুষ উপলব্ধি করে তা আমরা দেখতে চেয়েছি। পরিবর্তনের এই উপলব্ধি ও পর্যবেক্ষণ থেকে আমাদের গবেষিত গ্রামের অধিবাসীরা আমাদের যা বলেছেন, আমরা যা দেখেছি তার উপর ভিত্তি করে পরিবর্তনের দুইটি রূপ আমাদের সামনে আসে। এক ধরনের পরিবর্তন যা চোখে দেখা যায়, বিশেষত বস্তুগতভাবে যে পরিবর্তনকে দেখা যায়। আরেক ধরনের পরিবর্তন আছে যা চোখে দেখা যায় না বা বস্তুগতভাবে উপলব্ধি করা যায় না। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই, গ্রামের পরিবর্তনের কথা বলতে গেলেই দৃশ্যমান নানা পরিবর্তনের কথা দিয়ে আলোচনা শুরু হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অবকাঠামোগত পরিবর্তন ও উন্নয়নের মাত্রা এক হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে আলোচনার ব্যাপ্তি কিছুটা বিস্তার লাভ করলে মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নিরবে ঘটে যাওয়া নানান পরিবর্তনের কথা তারা বলতে শুরু করেন। এর মাঝে তারা তাদের স্মৃতিবিজড়িত অতীত জীবনের সামাজিক সম্পর্কের দৃঢ়তা, সহমর্মিতা, সামাজিক মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-অনুষ্ঠান, বিনোদন, বিশ্বাস, চর্চা, অভ্যাস, মানসিকতা, আনন্দ, মান-সম্মান ইত্যাদি বিষয়াদি কেমন ছিল আর বর্তমানে কিরূপ হয়েছে? এই পরিবর্তনের পেছনে কী ধরনের প্রভাবক বা অনুঘটকগুলো ভূমিকা রাখছে সেগুলো আলোচনায় নিয়ে আসেন।

গ্রাম পরিচিতি

পরিবর্তনের মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে গ্রামগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া গুরুত্বপূর্ণ। তাই গবেষণার আওতাভুক্ত গ্রামগুলোর অর্থাৎ সুনামগঞ্জের পশ্চিম কাশিপুর, কুমিল্লার ভবানীপুর, কক্সবাজারের নয়াপাড়া, শরিয়তপুরের নলতা, জামালপুরের রামপুরা, খুলনার মাইলমারা, লালমনিরহাটের আরাজি শেখসুন্দর, সাতক্ষীরার গোবিন্দকাঠি-এর পরিচিতি নিচে তুলে ধরা হলো।

পশ্চিম কাশিপুর

পশ্চিম কাশিপুর গ্রামটি সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। হাওর অঞ্চলের একটি গ্রাম হওয়ায় পশ্চিম কাশিমপুর যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সরকারি-বেসরকারি নানা ধরনের সুযোগ সুবিধার দিক থেকে পিছিয়ে আছে। হাওর অঞ্চল হিসেবে এর যে দুর্গমতা তা আমাদের সামনে প্রকাশ পায় সেই গ্রামে গবেষক দলের সশরীরে উপস্থিত হওয়ার যে যাত্রা সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। গ্রীষ্মের শেষে ও বর্ষার শুরুর দিকে আমরা যখন প্রথম গ্রামটিতে যাই তখনো হাওরে পুরোপরি পানি আসে নাই, তবে কৃষকরা তাদের মাঠের ফসল ঘরে তুলেছে। পুরোপরি পানি না থাকায় কিছু পথ হেঁটে, কিছু পথ নৌকায় করে গ্রামটিতে পৌঁছাতে হয়। সুনামগঞ্জ জেলার হাওর এলাকাগুলোতে উপজেলা সদর পর্যন্ত সরাসরি রাস্তা বা পাকাসড়ক অবকাঠামো গড়ে উঠলেও অনেক গ্রামের সাথে উপজেলা সদরের সংযুক্ত করার জন্য পাকাসড়ক অবকাঠামো এখনো গড়ে উঠেনি, বিশেষ করে পশ্চিম কাশিপুর তেমনই একটি গ্রাম।

ভৌগোলিক অবস্থান ও হাওর প্রেক্ষাপটে সড়ক অবকাঠামোগত বিচ্ছিন্নতা এই অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা প্রাত্যহিক জীবনে ভিন্ন এক মাত্রা যুক্ত করে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের গ্রামগুলো থেকে। পানির সময় এবং শুকনা সময়—এই দুইটি ভিন্ন প্রেক্ষিত হাওরে মানুষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের দুইটি ভিন্ন বাস্তবতার সম্মুখীন করে। প্রতি বছরই তাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতায়ও এই দুই সময়ে ভিন্নতা সামনে আসে। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বাস্তবতার সাথে নিজেদের জীবন-জীবিকাকে মানিয়ে নিয়ে এখানকার মানুষদের টিকে থাকতে হয়। শুকনা সময়ে হাওরজুড়ে অবারিত ধানক্ষেত আর পানির মৌসুমে দিগন্তজোড়া জলরাশি। শুকনা মৌসুমে পায়েহাঁটা মেঠো পথ, আর যানবাহন বলতে ঠেলা গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, সাইকেল, আর মোটরসাইকেলই ভরসা, আর বর্ষায় নৌকা। শুকনা মৌসুম শেষে যখন বর্ষা আসতে শুরু করে তখন যাতায়াতের দুর্ভোগ প্রকট হয়ে উঠে কেননা নৌকা চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত গভীরতাও থাকে না আবার কোনো যানবাহনেও যাওয়া যায় না কাদা থাকার কারণে। ফলে কিছু পথ হেঁটে, কিছু পথ নৌকায় করে যাতায়াত করতে হয়। আবার, বর্ষামৌসুমে গ্রাম থেকে নিকটবর্তী হাটে বা বাজারে কিংবা সদরে যাতায়াতের জন্য 'লাইনের নৌকা' আছে, যা সময় ধরে চলাচল করে। নির্দিষ্ট সময়ের পরে আর নৌকা পাওয়া যায় না গ্রাম থেকে বাইরে যাওয়ার জন্য। ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ নৌকা ভাড়া নিয়ে গ্রাম থেকে যাতায়ত করার ব্যয় সাধারণ মানুষের আওতার বাইরে। যার দরুণ, পশ্চিম কাশিমপুর গ্রামটি সব সময়ই যাতায়াত ও যোগাযোগের প্রেক্ষিতে দুর্গম। তাই বাংলাদেশের হাওর অঞ্চলে গ্রামের পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা বোঝার জন্য এই গ্রামটি গবেষণার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এই গ্রামে মানুষের সাথে পরিবর্তন নিয়ে আলোচনাগুলোতে অভ্যন্তরীণ অভিবাসন, কৃষি, সংস্কৃতি, পরিবেশ, প্রাণ-প্রকৃতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমাদের মাঠকর্ম যখন হয়েছিল তখন গ্রামটির অংশ পানির নীচে আর এর মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো জেগে আছে উঁচু জায়গা, যাকে হাওরের মানুষ 'হাটি' বলে। হাটিগুলোতে গ্রামের পরিবারগুলো ঘর বেঁধে বসবাস করে এবং হাওরের ঢেউ থেকে নিজেদের হাটিকে রক্ষা করতে নানা পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। অন্যান্য গ্রামের প্রেক্ষিত থেকে দেখলে এক একটি হাটিকে একেকটা পাড়া হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

যেখানে বাংলাদেশের বেশিরভাগ এলাকায় যোগাযোগের জন্য রাস্তাঘাট এখন বেশ উন্নত এবং নানা ধরনের যানবাহন চলাচল করে সেখানে কাশিপুর গ্রামে বর্ষাকালে চারপাশে পানি থাকার কারণে এক হাটি থেকে অন্য হাটিতে যেতেও নৌকার উপর নির্ভর করতে হয়। কারণ এই সময় হাটিগুলো পানি দ্বারা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে।

ইউনিয়ন পরিষদের হিসাব মতে, এই গ্রামের মোট জনসংখ্যা ২১০০ এবং নারী-পুরুষ অনুপাত ৫০ঃ৫০। গ্রামে মোট ৪০০ টি খানা রয়েছে এবং এখানে হিন্দু এবং মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষই বসবাস করে, তবে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই গ্রামে আয়মূলক কাজে নারীদের অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে বাড়ছে। পূর্বে নারীরা কখনো পেটে ভাতে কখনো সামান্য মজুরির বিনিময়ে গ্রামেরই ধনী কৃষকের বাড়িতে কাজ করতো। এখন এই গ্রামের বেশ কিছু নারী এবং পুরুষ অভ্যন্তরীণ (ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী) এবং আন্তর্জাতিক (সৌদি আরব, ওমান, ইরান, জাপান) অভিবাসন করেছে। এছাড়া কৃষির ক্ষেত্রে এই গ্রামে বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে সবজি চাষ, জলমহালে মাছ চাষ, গবাদিপশু পালন, হাঁসের খামারসহ বিভিন্ন উদ্যোগ শুরু হয়েছে, যা আগে ছিল না। শিক্ষাক্ষেত্রে, গ্রামটিতে শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, এবং মাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষা নেওয়ার জন্য গ্রামের বাইরে যেতে হয়। এখানে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই, উপজেলায় রয়েছে একটি স্বাস্থ্য কমপেক্স। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের অফিস গ্রাম থেকে ২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সবচেয়ে কাছের বাজার শ্যামারচরে, যা গ্রাম থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তবে এই গ্রামে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা যেমন বিকাশ ও নগদের প্রচলন রয়েছে। ৪ কিলোমিটার দূরে কৃষি ব্যাংক এবং ১৫ কিলোমিটার দূরে উপজেলা সদরে রয়েছে সোনালী ব্যাংক। তাছাড়াও গ্রামভিত্তিক এনজিও (ব্র্যাক, আশা, গ্রামীণ ব্যাংক) এবং সরকারি (সিবিআরএমপি, পানি উন্নয়ন বোর্ডে) কিছু কর্মকাণ্ড ও প্রকল্প চালু রয়েছে। স্থানীয়দের মতে, আশেপাশে কোনো আশ্রয়কেন্দ্র নেই, তবে বন্যার সময় গ্রামের প্রাইমারি স্কুলভবনে মানুষ ও গবাদিপশু আশ্রয় নেয়।

রামপুরা

অন্যদিকে, জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার চিকাজানি ইউনিয়নের রামপুরা গ্রামটি উপজেলা সদরের নিকটবর্তী, এমনকি গ্রামটির কিছু অংশ পৌরসভার আওতাধীন। তবে এই গ্রামের পশ্চিম পাশ দিয়ে যমুনা নদী বয়ে গেছে আর প্রতিবছরই বন্যা এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রায় এক ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বন্যার পাশাপাশি নদী ভাঙনের ফলে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যাও এই গ্রামে কম না। নদী তীরবর্তী ভাঙনপ্রবণ স্থানের পরিবর্তন বুঝতে এই গ্রামের কৃষি, সংস্কৃতি এবং পরিবেশ, প্রাণ প্রকৃতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ঐতিহ্যগত দিক থেকে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার গুরুত্ব রয়েছে, বিশেষ করে উপনিবেশিক আমল থেকে এই উপজেলা আধুনিক রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত। এছাড়াও নানান কৃষি পণ্য উৎপাদন, কৃষিভিত্তিক শিল্পায়ন (যেমনঃ চিনি কল) এবং নানান লোকজ সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠানাদির প্রেক্ষিত থেকেও উপজেলাটি বেশ সমৃদ্ধ।

রামপুরা গ্রামটি উপজেলা সদরের পাশে হওয়ায় উপজেলা সদরের সাথে যেমন সংযুক্ত একইভাবে জেলা সদর ও দেশের অন্যান্য শহরগুলোর সাথে সড়ক ও রেলপথে সংযুক্ত। এছাড়াও এই গ্রামের নিকটবর্তী নদীর ঘাট থেকে যমুনার ওপারের জেলাগুলোর সাথেও নৌপথে যোগাযোগ আছে, আর গ্রামের ভেতরের রাস্তাগুলোও পাকা হয়েছে। ফলে যোগাযোগ অবকাঠামোগত দিক থেকে এই গ্রাম নানান বিবেচনায় বেশ এগিয়ে রয়েছে।

এই গ্রামে আনুমানিক জনসংখ্যা ৯০০-১০০০ জন। এর মধ্যে ভোটার সংখ্যা ৫৭৫ জন। নারী ভোটার ৩০০ জন এবং পুরুষ ভোটার ২৭৫ জন। গ্রামে সর্বমোট খানার সংখ্যা আনুমানিক ১৫০-১৭৫ টি এবং শিক্ষার হার প্রায় ৭৫-৮০%। গ্রামের সবাই মুসলিম এবং এখানে একটি মসজিদ রয়েছে। রামপুরা গ্রামে নানান পেশার মানুষ রয়েছে, তবে কৃষিভিত্তিক পেশার সাথে সম্পৃক্ততা বেশি, যেমন—কৃষক, কৃষিশ্রমিক, দিনমজুর, খামারী হিসাবে। এছাড়াও অভিবাসী, রাজমিস্ত্রী, চাকুরিজীবি, ব্যবসায়ী রয়েছেন। অভিবাসনের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও মৌসুমি অভিবাসনের হার বেশি। ঋতুভেদে ধান, পাট, গম, সরিষা, ভুট্টা, আঁখ, পানিফল, বিভিন্ন রকম সবজি গ্রামে চাষ করা হয়ে থাকে। এখানে দেখা যায় যে, মাঠকৃষি থেকে খামারভিত্তিক কৃষির দিকে তারা বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে যদিও বেশিরভাগ শিক্ষার্থী মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত, কিছু মানুষ তাদের সন্তানকে মাদ্রাসায় পাঠায়। যাদের একটু সামর্থ্য আছে তারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাইতে কিন্ডারগার্টেন স্কুলে বেশি পাঠায়। গ্রামে একটি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে। ৩ কিলোমিটার দূরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছে এবং ২.৫ কিলোমিটার দূরে বাজারে ফার্মেসি রয়েছে। ব্র্যাকের ক্লাইমেট এডাপটেশন ক্লিনিক ব্র্যাক, উপজেলা কৃষি ও পশুপালন অধিদপ্তর ২ কিলোমিটার দূরত্বে। পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে গ্রামের বেকারদের মধ্যে বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত 'শিক্ষিত বেকার'। গ্রামে তিনটা দোকান আছে যেখানে মোবাইল ব্যাংকিয়ের সেবাসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায়। ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, ব্যুরো বাংলাদেশ, ইত্যাদি এনজিও কার্যক্রম দেখা যায়। গ্রামে একটি ইটের ভাটা রয়েছে। দুর্যোগকালীন সময়ে বিশেষত বন্যার সময়ে এই ইটভাটা এবং গ্রামের উঁচু স্থানে অবস্থিত বাড়ি, পুরাতন রেল লাইন গ্রামের মানুষদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ভবানীপুর

ভবানীপুর কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানার একটি গ্রাম। প্রচলিত আছে, এই গ্রামে একসময় ভবানী নামে একজন রানী তার সাথীদের নিয়ে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। রানীর নাম অনুসারে এই গ্রামের নাম হয় ভবানীপুর। আবারও জানা যায়, অনেক অনেক বছর আগে রানী ভবানী ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে এসে জানতে পারেন এলাকার মানুষের পানির কষ্টের কথা, আর প্রজাহিতৈষী রানি পাশের গ্রামে একটা দীঘি খনন করলেন। সেই থেকে এই অঞ্চল জেলা সদর থেকে ৪-৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। গ্রামটি উপজেলার এবং কুমিল্লা সদরের সাথে পাকাসড়কের মাধ্যমে যুক্ত। সামগ্রিক যোগাযোগ অবকাঠামোর দিক থেকে বিবেচনা করলে ভবানীপুর সড়ক অবকাঠামোগত এবং ভার্চুয়াল বা "অন-লাইন" উভয় দিক থেক বেশ এগিয়ে থাকা একটা গ্রাম।

বিশেষত এই গ্রামের প্রবাসী পরিবারগুলো বিশ্বের নানান দেশে অবস্থানরত তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে ইন্টারনেটে যোগাযোগ করছে প্রতিনিয়ত।

একটি পাকা রাস্তা গ্রামটির মাঝবরাবর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে চলে গেছে। রাস্তার দুই পাশে রয়েছে অনেকগুলো বাড়ি, মসজিদ আর ফিশারি (যে পুকুরে মাছ চাষ করা হয়)। গ্রামে ঢুকতেই চোখে পড়ে রাস্তার দুই পাশে ফিশারি আর এর তীব্র গন্ধ আসে নাকে! মাছ অল্প সময়ে বড় করার জন্য ফিশারিতে যে অধিক পরিমাণ খাদ্য এবং মেডিসিন ব্যবহার করা হচ্ছে তা এই গন্ধ থেকেই অনুমান করা যায়।

গবেষক দলের পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায়, আনুমানিক ৭০-৮০ শতাংশ পরিবারের কেউ না কেউ কাজের সূত্রে প্রবাসে রয়েছেন। এই গ্রামের দ্রুত পরিবর্তনের পেছনে অভিবাসন মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে বলে মনে হয়েছে। অভিবাসনের ফলে গ্রামের ভৌত অবকাঠামোর অনেক বড় পরিবর্তন হয়েছে, পাশাপাশি গ্রামের পরিবেশের উপরও এর প্রভাব পড়েছে। গ্রামের যারা দেশে রয়ে গেছে তারা মূলত কৃষির সাথে সম্পৃক্ত। ভবানীপুর গ্রামে মাঠ কৃষির মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাষ হয় ধান এবং কচুর লতি। এছাড়া চাষ হয় প্রচুর পরিমাণে মাছ, তাই এখানে অনেক ফিশারি চোখে পড়ে।

ভবানীপুর গ্রামের একমাত্র বাজার যা 'সৈয়দ মার্কেট' নামে পরিচিত সেখানে তিনটা বিকাশ এজেন্ট রয়েছে। ভবানীপুর গ্রামে পাকা দালান, খাড়া টিনের ঘর (ঘরের ভেতরে কাঠ দিয়ে নানারকম ডিজাইন করা) আর কাটকাবাড়ি (টিনের ঘরের সম্মুখে কাঠ দিয়ে ডিজাইন করা বাড়ি) চোখে পড়ে। এই গ্রামে রয়েছে ছয়টি মসজিদ, একটি মাদ্রাসা, একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিদ্যালয় সংলগ্ন খেলার মাঠ, সৈয়দ মার্কেট, একটি নার্সারি যা খন্দকার নার্সারি নামে পরিচিত, একটা ওয়ার্কশপ আর প্রচুর পরিমাণ ফিশারি। ভবানীপুর গ্রামে এখন পর্যন্ত দরবার (সালিশ ব্যবস্থা) বিরাজমান রয়েছে। এই গ্রামের লোকজন সাধারণত থানা পুলিশ না করে, নিজেরাই নিজেদের সমস্যা মিটমাট করে ফেলে। এই সালিশ ব্যবস্থার প্রধান বিচারক থাকেন ভবানীপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান (একনাগাড়ে তেইশ বছর চেয়ারম্যান পদে ছিলেন), যার বাড়ি এই ভবানীপুর গ্রামেই। ভবানীপুর গ্রামের সবাই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। এখানে সর্বোমোট সাতটি মসজিদ রয়েছে। এই গ্রামে বাড়িগুলো পরিচিতির ক্ষেত্রে জ্ঞাতিসম্পর্ক, বিশেষ করে গোষ্ঠীভিত্তিক পরিচয়ের একটা ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়, যেমন- সৈয়দবাড়ি, গাজীবাড়ি, মিয়াবাড়ি, মজুমদারবাড়ি ইত্যাদি। এর বাইরেও নানান পরিচয়ে বাড়িগুলো পরিচিত যেমন- হাজিবাড়ি, মাস্টারবাড়ি, সুয়ারবাড়ি। গবেষকদল অনুধাবন করে যে, এই বাড়িগুলোর আলাদা আলাদা পরিচিতি গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ইত্যাদি বহুমাত্রিক গুরুত্ব রয়েছে।

স্থানীয়দের মতে, ভবানীপুর গ্রামে আনুমানিক পুরুষ ৫৫ শতাংশ এবং নারী ৪৫ শতাংশ এবং খানার সংখ্যা ৩০০। ভবানীপুর একটি আদর্শ শিক্ষিত গ্রাম হিসেবে পরিচিত। আশেপাশের যেকোনো গ্রামের তুলনায় এই গ্রামে শিক্ষার হার বেশি। এই গ্রামে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটা মাদ্রাসা রয়েছে। এই গ্রামে সরকারি চাকরিজীবি, বেসরকারি চাকরিজীবী, প্রবাসী, ব্যবসায়ী, কৃষক, দিনমজুরসহ নানা পেশার মানুষের বাস। গ্রামের নারীরাও নানা পেশায় জড়িত যেমন—সরকারি চাকরি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, গার্মেন্টসকর্মী,

এবং গৃহকর্মী। এই গ্রামের পুরুষ উদ্যোক্তার মধ্যে বেশিরভাগই দেখা যায় কৃষি এবং ফিশারির ক্ষেত্রে এবং নারীদের মধ্যে কুটির শিল্প, পোশাক তৈরি, যেগুলো অনলাইনে বিক্রি করা হয়। এগ্রামের জমি মূলত দুই ধরনের—সমতল এবং নিচু। বসতবাড়ির জমিগুলো সমতল এবং চাষাবাদের জমিগুলো নিচু। বরুড়া উপজেলা এই গ্রাম থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, যেখানে আছে একটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল, যেসব যায়গায় এই গ্রামের মানুষ চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকে। এই গ্রামের সৈয়দ মার্কেটে দুটি ফার্মেসি আছে, যেখান থেকে তারা প্রাথমিক চিকিৎসা নেয়। বরুড়ায় কৃষি ও পশুপালন অফিস অবস্থিত, যেখান থেকে গ্রামের মানুষ এসব বিষয়ে সেবা ও তথ্য পেতে পারে।

গ্রামের কয়েকজনের তথ্যমতে, এই গ্রামে বেকারত্বের হার ৫-৮%, এর মধ্যে অনেক যুবক এবং পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যাক্তির সংখ্যা বেশি। এই গ্রামের বিনোদনের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো সৈয়দ মার্কেট। যেখানে ৩ টা মুদি দোকানে বিকাশ ও নগদ আছে, এবং তারা মোবাইল নেটওয়ার্কগুলোর সার্ভিসও দিয়ে থাকে। এছাড়া সব ধরনের মুদিপণ্য পাওয়া যায়। ব্যাংকিং সেবা পেতে গ্রামবাসীদের হয় বরুড়া অথবা বাতাইছড়ি যেতে হয়। এই গ্রামে দুটি পোল্ট্রি মুরগির দোকান আছে এবং ১৭ টা পরিবারের বিভিন্ন আকারের ফিশারি আছে। এই গ্রামের প্রায় ২৫০ জন পুরুষ প্রবাসী, যাদের সিংহভাগই মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান করছে। দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সৌদি আরব, দুবাই, ওমান এবং কাতার। এছাড়া মালয়শিয়া এবং ইউরোপের কিছু দেশে অবস্থান করছে। এই গ্রামে বিভিন্ন এনজিও এর ক্ষুদ্রঋণের সেবা প্রচলিত আছে। এর মধ্যে ব্র্যাক, আশা, গ্রামীণ, আব, সিডিপ উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলে বিশেষায়িত কোনো দুর্যোগ কেন্দ্রের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি, তবে দুর্যোগকালে প্রাথমিক কেন্দ্র হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় নেবার সুযোগ আছে।

নয়াপাড়া

নয়াপাড়া গ্রামটি কক্সবাজার সদর উপজেলার অন্তর্গত পি.এম খালি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। গ্রামটি ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের আওতাধীন। নয়াপাড়া গ্রামটি তিন ভাগে বিভক্ত—উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্যম নয়াপাড়া। এলাকার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় এক থেকে দেড় কিলোমিটার। এলাকার দক্ষিণ এবং মধ্যম ও উত্তর অংশের মাঝ দিয়ে কক্সবাজার টু ঢাকার মেইন রোড। মেইন রোডের পাশ দিয়ে পূর্ব এবং পশ্চিম এর মাঝ বরাবর পি.এম খালি ইউনিয়নের পাকা রাস্তা এবং এই অংশেই গ্রামের অধিকাংশ জায়গা অবস্থিত। নয়াপাড়া গ্রামের পাশ দিয়ে বাকখালী নদী এবং এলাকার ভিতর দিয়ে একটি খাল রয়েছে। গ্রাম থেকে পি.এম খালি ইউনিয়ন এর দূরত্ব হবে প্রায় দুই কিলোমিটার এবং উপজেলা পরিষদের দূরত্ব হবে প্রায় ৪ কিলোমিটারের মত। আবার সাগরের লবণাক্ত পানির প্রভাবে এ অঞ্চলে কৃষিতে এক ধরনের পরিবর্তনে প্রভাব ফেলে। কক্সবাজারের নয়াপাড়া গ্রামের মানুষের সাথে কথা বলার সময় গ্রামের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতগুলোর মধ্যে অভিবাসন, সংস্কৃতি এবং পরিবেশ অধিক গুরুত্বের সাথে উঠে আসে। তাছাড়া এই গ্রামটি শহরের কাছাকাছি হওয়ায় তার একটা প্রভাব এখানে পড়েছে। আবার কক্সবাজারে রোহিঙ্গা থাকার কারণ তার একটা প্রভাব গ্রামীণ মানুষের জীবনে বিশেষ করে আয়-রোজগারের ক্ষেত্রে পড়েছে।

উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্যম নয়াপাড়া নিয়ে মোট ভোটার প্রায় ১৭০০। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১০০০ এবং নারীদের সংখ্যা ৭০০। তবে শিশু, কিশোরসহ মোট জনসংখ্যা প্রায় ৩০০০। নয়াপাড়া এলাকায় মোট বাড়ি রয়েছে প্রায় ৪৮০ টির মত। তার মধ্যে উত্তর নয়াপাড়াতে ১৫০, দক্ষিণ নয়াপাড়াতে ১৩০ এবং মধ্যম নয়াপাড়ায় ২০০ টির মত বাড়ি রয়েছে। নয়াপাড়া গ্রামের শিক্ষার হার বেশ ভাল, তবে নারীদের চেয়ে পুরুষের শিক্ষার হার বেশি। গ্রামে শুধু মুসলিম ধর্মের মানুষ বসবাস করে। তবে গ্রামের পাশে হিন্দুপাড়া আছে, সেখানে হিন্দুরা বসবাস করে। উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্যম নয়াপাড়া নিয়ে মোট ৬টি মসজিদ রয়েছে। নয়াপাড়া গ্রামে বিভিন্ন পেশার মানুষ বসবাস যেমন—শিক্ষক, কৃষক, জেলে, ব্যবসায়ী, গাড়িচালক, চাকরিজীবী, দিন মজুর ইত্যাদি। নয়াপাড়া গ্রামে কর্মজীবী নারীও রয়েছে যারা সরকারি চাকরি, শিক্ষকতা, এনজিওর চাকরি, সেলাই কাজ, টিউশন, দিনমজুরিসহ নানা পেশায় যুক্ত।

পাশাপাশি এলাকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ বিদেশে থাকে। প্রায় প্রতি বাড়ি থেকে একজন করে লোক বিদেশে আছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব, আরব আমিরাত, ওমান, কাতারে। এলাকার মধ্যে অভ্যন্তরীণ অভিবাসন খুব কম দেখা যায়। তবে ফসলের মৌসুমে রোহিঙ্গা শ্রমিকেরা কাজ করতে আসে,পাশাপাশি আশেপাশের কিছু দরিদ্র পুরুষ এবং মহিলা এলাকায় কাজ করতে আসে। বর্তমানে নয়াপাড়া গ্রামে উদ্যোক্তার সংখ্যা উল্লেখ করার মত। এলাকার মানুষের যাতায়াত ও ব্যবসা গ্রামের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া ঢাকা-কক্সবাজার মহাসড়কের উপর নির্ভরশীল। এই রাস্তায় সব ধরনের যানবাহন যেমন—ট্রাক, বাস, জিপ, সিএনজি, টমটম, অটোরিকশা, কার, ডাম্পার ইত্যাদি চলাচল করে।

নয়াপাড়া গ্রামের দক্ষিণ অংশের কিছু মানুষ (আনুমানিক ৫/৬ জন) গরু ছাগল লালন পালন করেন। প্রত্যেকের গরু/ছাগলের সংখ্যা গড়ে ৪/৫ টি। গ্রামের মধ্যে একটি ব্রয়লার মুরগির খামার রয়েছে। নয়াপাড়া গ্রামটা কৃষিকাজেও সমৃদ্ধ। এখানে বছরে দুইবার ধান চাষ হয়। এ এলাকায় যেসব ফসল ও সবজির চাষ হয় সেগুলো হলো ঢেঁড়শ, বেগুন, ফুলকপি, বাধাকপি, টমেটো, আলু, চিচিঙ্গা, লাউ, লালশাক, কলমিশাক, মুলা, মুলাশাক ইত্যাদি। নয়াপাড়া গ্রামে তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তার মধ্যে একটি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি কেজিস্কুল। তবে নয়াপাড়ার পাশের এলাকায় একটা বড় বালিকামাদ্রাসা রয়েছে, যেটা ঝিলংজা ইউনিয়ন পড়ে। নয়াপাড়া গ্রামে একটা ক্লিনিক রয়েছে গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য সেবার জন্য। নয়াপাড়ার তিন ভাগে আলাদা বাজার রয়েছে। তবে গ্রামে একটা বড় বাজার আছে যেখানে সপ্তাহে দুই বার হাট বসে রবিবার এবং বৃহস্পতিবার। এলাকার ভিতরে মোবাইভিত্তিক আর্থিক সেবাসমূহ (Mobile financial services) পাওয়া যায়। নয়াপাড়া গ্রামের মধ্যে কৃষি ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক রয়েছে। তবে গ্রামের আশেপাশের এলাকার ১ কিলোমিটারের মধ্যে আরো অনেক ব্যাংকের সুবিধা পাওয়া যায়। নয়াপাড়া গ্রামে এনজিওদের ভুমিকা চোখে পড়ার মত, বিশেষ করে ব্র্যাক, আশা, প্রগতি, ব্যুরো বাংলাদেশ। নয়াপাড়া গ্রামে যে খালটি রয়েছে সেটির উপর ঐ গ্রামের কৃষি বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আর এই খালটির সাথে জিয়াউর রহমানের স্মৃতি রয়েছে, বিশেষ করে খালের ধারে কর্দমাক্ত অবস্থায় বসে থাকা জিয়াউর রহমানের যে ছবিটি পত্র-পত্রিকাতে এসেছে সেটি নাকি এই খালের পারে তোলা। এই খাল খননের সময়ে জিয়াউর রহমান এই গ্রামে এসেছিলেন তা এই গ্রামের বয়স্ক মানুষের মনে একটা স্মরণীয় ঘটনা।

নলতা

নলতা শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার একটি গ্রাম। নড়িয়া উপজেলা থেকে গ্রামটির দূরত্ব ৫.৭ কিলোমিটার। গ্রামটি ভুউমখারা ইউনিয়নের ৩ টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে গ্রামের দূরত্ব প্রায় ৩ কিলোমিটার।

নলতা গ্রামে প্রবাসীর সংখ্যা বেশি, যাদের মাঝে অধিক হচ্ছে ইতালি অভিবাসী। নলতার মোট খানা ১২০০ এর মত আর প্রায় ১০০ এর মত ফাঁকা বাড়ি আছে, যারা গ্রামে থাকে না।

নড়িয়া-ঘরিষার সড়কের কদমতলা নামক একটা বাজারের পাশ দিয়ে চিকন পিচঢালা রাস্তা ঢুকে গেছে নলতা গ্রামের দিকে। সরু পিচঢালা রাস্তার দুপাশে ঘন গাছপালা আর তার ফাঁকে ফাঁকে অত্যাধুনিক পাকা বাড়ি। টিনের ঘরও আছে। তবে পাকা বাড়ির সংখ্যাই বেশি। গ্রামের শুরুতেই বড় দুটো মাছের পুকুর। তারপর ছোট একটা বিল। পশ্চিম নলতা হয়ে মধ্য নলতার দিকে আসতে হাতের ডানদিকে আল কুরআন একাডেমি আর বামদিকে বড় এক বিল। মধ্য নলতা পার হয়ে পূর্ব নলতার দিকে রাস্তাটা ভাঙাচোরা। রাস্তার পাশের মৃত খালের জল পঁচে আছে। রাস্তা ভাঙাচোরা হলেও দুপাশের পাকা বাড়ি এই অঞ্চলের লোকজনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রকাশ করে। আবার তিন কিলোমিটার দূরে ঘরিষার বাজার। নলতা বাজার সংলগ্ন নলতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ।

নলতা শতভাগ মুসলিম অধ্যুষিত। মসজিদ ৯টি, সবগুলোতেই মক্তব চালু আছে। নানা পেশার মানুষের বাস রয়েছে এই গ্রামে যার মাঝে প্রবাসীই বেশি। এছাড়া রয়েছে ব্যবসায়ী, কৃষক, চাকরিজীবি, কৃষিউদ্যোক্তাসহ অন্যান্য পেশার মানুষ।

নলতা গ্রামে অটোরিক্সা, মোটরসাইকেল, বাইসাইকেল, ভ্যানগাড়ি বেশি চলাচল করে। এখানকার বেশিরভাগ জমি নিচু। ফসলের মধ্যে আছে ইরিধান, মাছ, পাট, কলা, পেঁপে, শাক-সবজি (স্বল্পপরিসরে)। নলতা গ্রামে ৬ মাস চাষ সম্ভব বাকি ৬ মাস জলাবদ্ধতা থাকে যা চলছে ২০১৫ সাল থেকে। ৬ মাস ধান হয়। পাশাপাশি কিছু জমিতে কলই আর সরিষা চাষ হয়।

গ্রাম থেকে হাই স্কুলের দূরত্ব প্রায় ৩ কিলোমিটার, কলেজের দূরত্ব প্রায় ৬ কিলোমিটার। স্থানীয় পল্লীডাক্তার গ্রামের প্রাথমিক চিকিৎসার চাহিদা মেটাচ্ছেন গত ৭ বছর যাবত। নলতায় কমিউনিটি ক্লিনিকের ডাক্তারও গ্রামে আছেন ২০১১ সাল থেকে।

এই গ্রামে প্রায় ৯০ ভাগ পরিবারেরই কোন না কোন সদস্য বিদেশে আছেন, রেমিটেন্সের টাকায় সংসার চলে। ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সী যুবকদের প্রায় সবাই বেকার, তারা ইতালি যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে।

নলতা গ্রামে বিনোদনের স্থান বলতে, বাজার, খেলার মাঠ, মুলফতগঞ্জ লঞ্চঘাট। নলতা বাজারটি ছোট। এখানে সর্বমোট ২৩ টি দোকান আছে। এছাড়া নলতা থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরের চাঁকধ বাজার থেকেই গ্রামের মানুষ কাঁচাবাজার ও অন্যান্য বাজার করে থাকে। এই গ্রামে ফেরিওয়ালার প্রচলন রয়েছে। নলতা

বাজারেই বিকাশ ও নগদের এজেন্ট আছে, তবে গ্রামের অধিকাংশ মানুষ সার্বিক কেনাকাটার প্রয়োজনে চাঁকধ বাজারে যায়। চাঁকধ বাজারে ন্যাশনাল ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট আছে। ইসলামী ব্যাংকের সিআরএম একটি বুথ রয়েছে। এই গ্রামের রেমিটেন্সের ৮০ ভাগই ন্যাশনাল ব্যাংকে আসে। গ্রামের মানুষ সিকদারের ব্যাংক নামে চেনে।

২০১৫ সালের আগে নলতায় মাছের প্রজেক্ট ছিল না বলে স্থানীয়রা জানায় তবে বর্তমানে নলতা-গোড়াগাঁও রোডের পাশে বেশ কয়েকটা ফিশারি দেখা যায়।

গ্রামে শুধুমাত্র মাইক্রোফিন্যান্সের এনজিওগুলো সচল। এই গ্রামে প্রায় ১৯টি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান কাজ করে। সব থেকে বেশি জনপ্রিয় ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক। এছাড়া ইসলামী ব্যাংক, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন, শক্তি, ন্যাশনাল ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশাসহ আরও প্রতিষ্ঠান ঋণ দিয়ে থাকে। সরকারিভাবে নড়িয়া কৃষিঅফিস থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প সহায়তা নলতা গ্রামের মানুষ পেয়ে থাকে। যেমন, বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষ উপলক্ষ্যে পারিবারিক পুষ্টিবাগান প্রকল্প থেকে সহায়তা পেয়েছে নলতার ৭টি পরিবার। গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র ঘোষণা করা হয়েছে।

মাইলমারা

মাইলমারা গ্রামটি একটি রাস্তার দুই পাশে বিস্তৃত, এই গ্রামটি প্রায় এক মাইল জুড়ে অবস্থান করায় এটির নাম হয়েছে মাইলমারা। গ্রামটি খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার বটিয়াঘাটা ইউনিয়নের দুই নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত। গ্রামের দুই পাশ দিয়ে ছোট ছোট খাল বয়ে গেছে, যেগুলো এই গ্রামের জীবিকার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এই গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ কৃষি পেশার সাথে যুক্ত থাকার দরুন গ্রামটি কৃষিপ্রধান। তবে এই গ্রাম শিক্ষায় অনেকটা এগিয়ে গেছে। এই গ্রামে যৌথ পরিবার একেবারে নেই বললেই চলে। একক পরিবারের সংখ্যাই বেশি। গ্রামের লোকজনের কৃষির পাশাপাশি অন্যান্য পেশার (ইজিবাইক, মোটরভ্যান, মাছের ঘেরের সাথে সবজির চাষ ইত্যাদি) সাথে যুক্ততা দেখা যায়। এসব পেশায় নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এই গ্রামকে বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রাম থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করেছে। কৃষি থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মত। এখানে বসবাস করা জনসংখ্যার অধিকাংশ সনাতন ধর্মাবলম্বী। উফশী/ইরি ইদানীংকালে চাষ হচ্ছে কিন্তু দেশের অন্য অঞ্চলের তুলনায় কম। একটা সময় দুর্গম যোগাযোগ ও জলাবদ্ধতার কারণে লবণাক্ততার প্রভাব ছিল অনেক। বর্তমানে প্রযুক্তির ব্যবহার ও অভিনব চাষাবাদের পাশাপাশি নারী ও পুরুষের সমানভাবে যোগদান এই এলাকার দৃশ্যপট পরিবর্তন করে চলেছে।

গ্রামে ২-৩টা দোতলা ছাদের বাড়িসহ পাকা বাড়ি রয়েছে অনেকগুলো, এছাড়া মাটির দেয়াল টিনের চাল, টিনের ঘর বা বাঁশের বেড়া দিয়ে গড়া বাড়ি বেশি দেখা যায়। নদীর পাশে দিয়ে বাঁধ সংলগ্ন রাস্তার পাশ

দিয়ে গ্রামের বাজার। এই গ্রামে ঘেরভিত্তিক মাছ ও শাক-সবজি সারাবছর গ্রামে চাহিদা মিটিয়ে বাইরে বিক্রি হচ্ছে। উপজেলা সদর গ্রাম থেকে ৬.৫ কিলোমিটার, ইউনিয়ন ও উপজেলা পাশাপাশি।

গ্রামের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১০০০ এর কাছাকাছি, ভোটার ৭২৫ জন। গ্রামে বর্তমানে ২২২টি হিন্দু পরিবার এবং ৮টি মুসলিম পরিবার রয়েছে। স্থানীয় মানুষের মতে ৭০% মানুষ শিক্ষিত। গ্রামের মধ্যভাগে মূল একটি মন্দির রয়েছে আর বাজারে একটি কালীমন্দির রয়েছে।

এখানে কৃষক (কৃষি ও ঘের), বর্গাচাষী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (দোকানী), দিনমজুর, ভ্যানচালক , চাকুরীজীবী, অটোচালক, শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী, প্রবাসী, মৎসজীবী, ভাস্কর মৃৎশিল্পী, কৃষিযন্ত্রচালক, খামারী (মুরগি, শূকর) ইত্যাদি পেশার মানুষের বাস রয়েছে। গৃহস্থালির কাজের পাশাপাশি আয়মূলক বিভিন্ন ক্ষুদ্র কাজের (হাঁসমুরগি পালন, সবজি, মৎস্য আহরণ) সাথে জড়িত প্রায় ৭০% নারী, এরমধ্যে ব্যবসা ও কৃষিশ্রমিক হিসাবে ২৮% নারীরা কাজ করে। এখানে পুরুষ উদ্যোক্তারা সাধারণত ঘের, কৃষিজমি চাষ (ক্যাশক্রপ), দোকানদারি, কৃষি যন্ত্রপাতির ভাড়া, ক্ষুদ্র ব্যবসার (মুরগির ফার্ম, ধানের ব্যবসা) মতো বিভিন্ন আর্থিক আয়ের উৎস সৃষ্টি করে থাকে। নারী উদ্যোক্তারা সাধারণত গৃহস্থালির পাশাপাশি হাঁসমুরগি, পশুপালন, সবজি বাগান, প্রাকৃতিক উৎস থেকে (মাছ, সবজি, কাঁকড়া) সংগ্রহ করে এবং বেপারির কাছে বিক্রি করে। তুলনামূলক কর্ম ও ব্যবসাক্ষেত্রে নারী-স্বাধীনতার প্রসার ঘটেছে বিগত ৭-৮ বছরে।

গ্রামের রাস্তা ২০১৮ সালে পিচ ঢালা হয়। এটা মূলত গ্রামের মাঝ বরাবর চলে গেছে, যার মাধ্যমে উপজেলা শহরের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে অটো ও ব্যাটারিচালিত ভ্যানের ব্যবহার বেশি। পাশাপাশি মোটরসাইকেল, রিকশা, সিএনজি ও গাড়ি চলে। পাশের গ্রামে প্রাইমারি ও হাইস্কুল রয়েছে ১ কিলোমিটার ও ১.৫ কিলোমিটারের মধ্যে। কলেজ ও উচ্চশিক্ষার জন্য বটিয়াঘাটা উপজেলা ও খুলনা শহরে যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা। গ্রামের বাজার সংলগ্ন রাস্তায় ২০২১ সালে একটি কমিউনিটি ক্লিনিক হয়েছে। এছাড়া পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থকর্মী, পুষ্টি প্রোগ্রাম (সাইমা ওয়াজেদ পুতুল), ব্র্যাক ওয়াশ গ্রামে কাজ করছে। গ্রামের মাঝেই মেম্বারের বাড়ি, আর চেয়ারম্যানের বাড়ি ৩ কিলো দূরত্বে (তবে চেয়ারম্যান ৬ কিলো দূরত্বে উপজেলা সদরে থাকেন)। প্রাপ্তবয়স্ক লোকজনের মধ্যে বেকারত্বের সংখ্যা শিক্ষিত যুবদের মাঝে বেশি, যারা পড়াশোনা শেষ করে চাকুরি না পেয়ে বেকার বসে আছে। বয়স্ক এবং মধ্যবয়স্ক লোকেরা মূলত বাজারের চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে এবং তাস ও দাবা খেলে সময় কাটায়। যুবকরা খেয়াঘাটের পাশের চায়ের দোকানে ক্যারম এবং লুডু খেলে, বাজারের ক্লাবের দোতলায় একসাথে আড্ডা দেয় ও এখানে বসে অনলাইন বেটিং করে। এছাড়াও বিকেলবেলা স্থানীয় বালির মাঠে ফুটবল, ক্রিকেট খেলতে যুবকদের দেখা যায়।

গ্রাম থেকে ০.৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আউশখালি এই গ্রামের মূল বাজার। মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের এজেন্টের দোকানগুলো মাইলমারা বাজারেই অবস্থিত। গ্রাম থেকে ব্যাংকিং সেবা নিতে বটিয়াঘাটা উপজেলায় যেতে হয়, যা ৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সরকারি প্রতিষ্ঠান পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি অধিদপ্তর, পশু হাসপাতাল তাদের কার্যক্রম এই গ্রামে চালু রেখেছে। এই গ্রামে এনজিওর ইতিহাস বেশ পুরাতন,

২৫-৩০ বছর আগে থেকে ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, তারপরে হীড বাংলাদেশ, নিজে করি, চলন্তিকা ইত্যাদি এনজিও এই গ্রামে কাজ করে আসছে।

প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই পারিবারিক খামারভিত্তিক গরু পালন করা হয় এবং গ্রামে একটি শূকরের খামার রয়েছে। এই গ্রামে ঘেরভিত্তিক মাছ চাষ, গ্রামের মোট ৩৫ টি পরিবারের নিজস্ব বা বর্গা নিয়ে ঘের করা আছে। দেশের ভেতরে চাকুরিসূত্রে অনেকেই অন্যান্য জেলায় বসবাস করেন। দুর্যোগকেন্দ্র দুইটি—বটিয়াঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাইটভাঙা প্রাথমিক বিদ্যালয়। বটিয়াঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দূরত্ব ০.৫ কিলোমিটার. এবং মাইটভাঙা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দূরত্ব ১.০ কিলোমিটার।

আরাজি শেখসুন্দর

আরাজি শেখসুন্দর গ্রামটি লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার অন্তর্ভুক্ত। সানিয়াজান ব্রিজ পার হয়ে সানিয়াজান বাজারের মুখ থেকে পাকা রাস্তা সোজা আরাজি শেখসুন্দর গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলো পাকা হলেও প্রায় সাড়ে ৫ কিলোমিটার কাঁচা আছে, যা বৃষ্টির পানিতে কাদা হয়ে যায়। কিছুকিছু জায়গায় খানাখন্দ চোখে পড়ে। বাড়িঘরগুলো খুব বেশিদিনের পুরোনো বলে মনে হয় না। টিনের বাড়িগুলো চকচক করছে। তাছাড়া অনেক পাকাবাড়িও লক্ষ্য করেছি। এছাড়াও অনেক নির্মাণাধীন বাড়ি দেখেছি। গ্রামে সুপারি গাছ সবচেয়ে বেশি চোখে পড়েছে। এছাড়া আম, কাঠাল, কলা, মেহেগনি, ইউক্যালিপটাস, ইত্যাদি গাছ রয়েছে। মাঝেমাঝেই রাস্তার দুপাশে ভুট্টার গোডাউন দেখা যায়। বাড়ির আশপাশে আদা, হলুদ, বিদেশি ঘাসের ক্ষেত, লাউ কুমড়ার গাছ, ফসলের মাঠ চোখে পড়ে।

হাতিবান্ধা উপজেলা থেকে গ্রামের দূরুত্ব ১৮ কিলোমিটার। সানিয়াজান ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামের মধ্য অবস্থিত। গ্রামের শুরু ও শেষ মাথা থেকে ইউনিয়ন পরিষদে আসতে ১ কিলোমিটার থেকে ৪ কিলোমিটার দুরুত্ব হবে জানা যায়। ইউনিয়ন পরিষদটি নয়টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। ইউনিয়নটি ২০১১ সালের ৮ এপ্রিল স্থাপিত হয়। ইউনিয়নের সীমানার উত্তরে ভারত ও পশ্চিমে নীলফামারি জেলা অবস্থিত। ইউনিয়নে গ্রাম ও মৌজার সংখ্যা ৪টি। ইউনিয়নের তিন, চার নাম্বার ওয়ার্ড নিয়ে আরাজি শেখসুন্দর গ্রাম গঠিত।

জমিদারি আমলে শেখর সুন্দর নামে একজন জমিদারের সেরেস্তা খাজনা তুলত, যার নাম অনুসারে কালের বিবর্তনে শেখর থেকে শেখ সুন্দর। আর এখানে আড়া বা বাঁশ ঝাড়, ঝোপ ছিল এখান থেকে আড়া নামটি যোগ হয়ে আরাজি শেখসুন্দর। আরেকটি গল্প প্রচলিত রয়েছে লোক মুখে—এখানে আরাজি শেখ সুন্দর নামে পরিবার বসবাস করতো, তাদের নামেই গ্রামের নামকরণ হয়েছে। ভোটার সংখ্যা ১৬৯৪ জন। এর মধ্য নারী ভোটার ৮৬৪ জন ও পুরুষ ভোটার ৮৩০ জন। গ্রামের মোট গৃহস্থালীর সংখ্যা ৫৫২টি ও মোট জনসংখ্যা ২৭২৮ জন। এর মধ্য নারী ১৩৭০ জন, পুরুষ ১৩৫৮ জন। স্থানীয় মানুষের মতে, শিক্ষার হার ৬৫ শতাংশ; উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস অনুযায়ী ৭০ শতাংশ। গ্রামে কোনো হিন্দু পরিবার নেই, সবাই মুসলিম। মসজিদের সংখ্যা ৭টি। দুইটি মাদ্রাসা ও এতিমখানা আছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে।

কৃষি ৮০ শতাংশ, ব্যবসায়ী ৫ শতাংশ, সরকারি ও বেসরকারি চাকরিজীবী ৪ শতাংশ, দিনমজুর শ্রমিক শতাংশ ৮ শতাংশ, অন্যান্য পেশা ১ শতাংশ। কর্মজীবী নারীর সংখ্যা দশ থেকে পনের জন (প্রায়)। গ্রামে কোন নারী উদ্যোক্তা নাই, তবে পুরুষ উদ্যোক্তা আছে আট জন, যারা পোল্ট্রি, লেয়ার ও সোনালী মুরগির খামারের সাথে যুক্ত রয়েছে। গ্রামে নানা ধরনের ব্যবসা রয়েছে। যেমন—ধান, ভুট্টা কেনা বেচার ব্যবসা, মুড়ি ও মুদি দোকানের ব্যবসা, সার, বীজ, কীটনাশকের ব্যবসা। বেকারত্বের হার দুই শতাংশ, মূলত শিক্ষিত শ্রেণি যাদের বয়স ২৫ থেকে ৩৫ এর মধ্য।

সানিয়াজান বাজার থেকে সানিয়াজান ইউনিয়ন পরিষদমুখী রাস্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অধিকাংশ স্কুল, গোডাউন, বাজার, কমিউনিটিক্লিনিক, বিএডিসির সেচ প্রকল্প, দোকানপাট রাস্তার দুই পাশে গড়ে উঠেছে। আনুমানিক সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা। পরিবহন ব্যবস্থা বলতে অটোরিক্সা, অটোভ্যান।

গ্রামে দুই ধরনেরর জমি আছে—উঁচুজমি ও দোলা বা নিচুজমি। উঁচু জমির পরিমাণ ৮০ শতাংশ। দোলাজমি ২০ শতাংশ। উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তার মতে, আরাজি শেখসুন্দর গ্রামে জমির পরিমাণ ২৮০ হেক্টর। এর মধ্য উঁচু জমির পরিমাণ ২২৪ হেক্টর, দোলা জমির পরিমাণ ৮০ হেক্টর। প্রধান ফসল হচ্ছে ধান, ভুট্টা ও আলু।

গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে গরু-ছাগল আছে। গ্রামে দুইটি বাড়িতে মহিষ পালন করে। গ্রামে খাস পুকুরের সংখ্যা ৮ টি যা সরকারিভাবে ইজারা দেয়া হয়। সারা গ্রামে ব্যক্তিমালিকানা পুকুরের সংখ্যা হবে ২৫ টি। গ্রামে ২০১২ সাল থেকে পোল্ট্রি মুরগির খামার চালু হয়েছে। ৬টি লেয়ার, দুইটি সোনালী মুরগির খামার চালু রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ অভিবাসীর সংখ্যা ৭০ থেকে ৮০ জন। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দকৃত অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে রাস্তা সংস্কার ও নির্মাণের কাজ চলছিলো গবেষণা চলাকালীন। ২০২১ সাল থেকে কম মূল্যে চাল, ডাল, তেল টিসিবি থেকে ইউনিয়ন পরিষদের তত্ত্বাবধানে দেয়া হয়। ভিজিডি কার্ডে দুই বছর ২৪ মাসে ৩০ কেজি করে চাল সহায়তা দেয়া হয়। গ্রামে কোনো দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নেই।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২টি। বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ১টি। শিক্ষার্থীরা আগে পায়ে হেঁটে, সাইকেলে স্কুলে যেতে, এখন অটোভ্যান ও অটোরিক্সাতে যাতায়াত করে। এতিমখানা ও হাফেজিয়া মাদ্রাসা আছে, যা ২০১১, ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রাম্য ডাক্তারদের চেম্বার ৫ কিলোমিটার দূরে। এমবিবিএস ডাক্তার দেখাতে হলে তাদের বড়খাতা যেতে হয় যা গ্রাম থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সরকারি ডাক্তার দেখাতে হলে ১৮ কিলোমিটার দূরে হাতিবান্ধা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হবে। গ্রাম থেকে চেয়ারম্যানের বাড়ি ২ কিলোমিটার দূরে, মেম্বারের বাড়ি গ্রামে। কৃষি ইনপুট সেন্টার তথা কৃষি উপকরণ যেমন, সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি ক্রয় করতে গ্রামের মানুষেকে কিনতে সানিয়াজান, তিস্তা কিংবা মণ্ডলবাজারে যেতে হয়, যেগুলো গ্রাম থকে ৪-৫ কিলোমিটার দূরে।

মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের দোকান গ্রাম থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সানিয়াজান বাজারে এজেন্ট ব্যাংকিং সুবিধা আছে। ইসলামী ব্যাংক, ডাচ বাংলা, ব্যাংক এশিয়ার এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা চালু আছে। গ্রামের মানুষকে ব্যাংকিং সুবিধা নিতে ১২ কিলোমিটার দূরে বড়খাতাতে যেতে হয়। যেখানে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, রুপালী ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা, গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা আছে। হাতিবান্ধা থেকে সোনালী ব্যাংকের সেবা নিতে হয়, গ্রাম থেকে যেটির দুরুত্ব ১৮ কিলোমিটার।

গোবিন্দকাঠি

সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ উপজেলা থেকে ১৫ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে ৩ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত গোবিন্দকাঠি গ্রাম। গ্রামের মাঝখান দিয়ে একটি রাস্তা চলে গেছে যেটা মূলত বিষ্ণুপুর থেকে হাটখোলা পর্যন্ত সংযুক্ত করেছে। স্থানীয়দের মতে, রাস্তাটি প্রথম মাটির রাস্তা হিসেবে প্রশস্ত করে করা হয় ১৯৮২ সালের 'কেয়ার কোম্পানি' এবং পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে কংক্রিটের করা হয় ২০১২ সালে। স্থানীয়দের ধারণা অনুযায়ী, রাস্তা পাকা হওয়ার পর গ্রামের ৮০ শতাংশ মানুষ সাইকেল ব্যবহার শুরু করে। ৪০ শতাংশ মানুষ সাইকেলের পাশাপাশি মোটরসাইকেল ব্যবহার করে। বাকি ২০ শতাংশ ভ্যানে যাতায়াত করে, যাদের অধিকাংশই নারী।

গ্রামের উত্তর পাশে হাটখোলা বাজার। যেখানে এক সময় জমজমাট হাট বসতো। এখন অনেকটা নিশ্চিহ্ন বলে ধরা হয়। গ্রামের উত্তর প্রান্তরেই একটি নদী বয়ে গেছে যেটার নাম হচ্ছে কাকশিয়ালী নদী। ২০০০ সালের আগেও নৌকা চলতো, ট্রলার চলতো যেটা দিয়ে মানুষ কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা, এবং খুলনাতে যেত। সেগুলো নাব্যতা হারিয়ে নৌযান চলাচলের অনুপোযোগী হয়ে গিয়েছে। তবে নদী পারাপারের জন্য খেয়া এখনো আছে। গ্রামের পূর্ব-উত্তর কোণে একটি সুইস গেট। গ্রামের পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে বয়ে গেছে একটি খাল যেটাকে কাটাখালি খাল বলা হয়। এ খালই গ্রামের পূর্ব পাশের সীমানা হিসেবে ধরা হয়। দক্ষিণ পার্শ্বে একটি রাস্তার মাধ্যমে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৪৭ একর আয়তনের এই গ্রামের মধ্যে অধিকাংশ স্থান জুড়ে লবণাক্ত পানির জলাভূমি, যেগুলো মাছের ঘের হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গ্রামের মোট ভূখণ্ডের ৩০ শতাংশ জায়গাতে মানুষের বসতি, রাস্তার পশ্চিম পাশে। পশ্চিম পাশের বাকি অংশ এবং সম্পূর্ণ পূর্ব পাশে বিস্তীর্ণ ঘের। মানুষের সম্পূর্ণ বসতির মাঝখানে একটি রাস্তা গেছে যার এক পাশে ৩১টি পরিবার অন্য পাশে ৮৯ টি পরিবার। এই গ্রামে মোট জনসংখ্যা প্রায় ৪৮৫ জন ও পরিবারের সংখ্যায় ১২০টি। এই গ্রামে পরিবার পরিকল্পনার সচেতনতার প্রভাব লক্ষনীয় দুইয়ের অধিক সন্তান নেওয়াটা প্রায় একেবারেই চোখে পরে না। স্থানীয়দের স্মৃতি থেকে জানা যায়, এই গ্রামে ১৯৭৫ সালের পর থেকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে সরকারিভাবে কাজ শুরু হয়েছিল। পুরুষদের এক তৃতীয়াংশ গ্রামের বাইরে থাকে মাছচাষ বা চাকরি করার তাগিদে। কিন্তু মহিলাদের প্রায় সবাই গ্রামে অবস্থান করে। গ্রামে মাছ চাষ এবং যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার সাথে সাথে গ্রামের পুরুষদের

অন্য গ্রামে যাতায়াত এবং গ্রামের বাইরে অবস্থান বেড়েছে। সামগ্রিকভাবে ভোটার তালিকা অনুসারে মহিলা এবং পুরুষের অনুপাত সমান।

২৫ বছর আগে এই গ্রামে শুধু কালী পূজা, সরস্বতী পূজা এবং পৌষ-পার্বণ অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু আর্থিক সচ্ছলতা বাড়ার সাথে সাথেই মানুষের পূজা পার্বণ এবং সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোর প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। গোবিন্দকাঠি গ্রামে বিভিন্ন ধরনের মন্দির রয়েছে তার মধ্যে দুর্গামন্দির এবং কালীমন্দির হল গ্রামের সার্বজনীন দুটি মন্দির। গ্রামের সবাই হিন্দু, এবং ১২০টি পরিবারের মধ্যে ১১৬ টি পরিবার নমঃশূদ্র এবং চারটি পরিবার ব্রাহ্মণ পুরোহিত। এসব ব্রাহ্মণ পরিবার গ্রামের সমস্ত পূজা পার্বণের মূল পরিচালনা দায়িত্বে থাকে। গ্রামের নমঃশূদ্র যারা আছে তারা সবাই মাছচাষের সাথে জড়িত। এসব ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের আয় হয় বিভিন্ন পূজা-পার্বণ থেকে পাওয়া প্রসাদ এবং অর্থ থেকে। পূর্বে সব ধরনের পূজা পার্বণের ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ডাকতো নমঃশূদ্ররা। তবে বর্তমানে নমঃশূদ্ররা নিজেরাই পূজাপাঠ করতে শিখেছে, যার কারণে ব্রাহ্মণদের ডাকে না আগের মত। গ্রামের মহিলারা তাদের বিকেলে অবসর সময় পুকুরঘাটে এবং পুরুষেরা হাটখোলা বাজারে আড্ডা দেয়।

এই গ্রামে আনুমানিক শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষকে শিক্ষিত গত ২৫ বছরে গ্রামে শিক্ষিতের হার যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে বেকারত্বের। গ্রামে শিক্ষিত তরুণদের বেশিরভাগই বেকার হয়ে আছে। গোবিন্দকাঠি গ্রামের মানুষ মৎস্য চাষকে কেন্দ্র করে জীবন নির্বাহ করে। গ্রামের শতকরা ৯৮ ভাগ লোক মাছ চাষের সাথে যুক্ত। তবে ব্রাহ্মণরা মাছ চাষে যুক্ত নয়। মানুষ দৈনিক মজুরিতে বিভিন্ন রকম কাজ করে। গ্রামে ৮-৯ জন চায়ের দোকানদার, মুদি দোকানদার ও কাঠমিস্ত্রি আছে। তাছাড়া এই গ্রামে শিক্ষক, পুলিশ, ডাক্তার, সেনাবাহিনী, ব্যাংকার, ইঞ্জিনিয়ারসহ বিভিন্ন পেশার লোক আছে। এই গ্রামের নারীরা দীর্ঘদিন ধরে কৃষিশ্রমের সাথে জড়িত। মহিলারা মাছের ঘেরে বিভিন্ন রকম কাজের সাথে যুক্ত, গ্রামে দৈনিক মজুরিতে যারা কাজ করে এমন নারীর সংখ্যা ১৬ জন। তাছাড়া মহিলারা শিক্ষকতা ও সমিতির সাথে যুক্ত। এই গ্রামে মোট ৮ জন মহিলা শিক্ষিকা রয়েছে।

গোবিন্দকাঠি গ্রামে দুইটি স্কুল আছে। এর মধ্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং অন্যটি উচ্চ বিদ্যালয়। যেগুলার দূরত্ব গ্রামের কেন্দ্র হতে ২০০ ও ৫০০ মিটার। গ্রামের কালীমন্দিরে হিন্দ ধর্মাবলম্বী বাচ্চাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠশালা রয়েছে। গোবিন্দকাটি গ্রাম থেকে উপজেলা হাসপাতালের দূরত্ব প্রায় ১৫ কিলোমিটারেরও বেশি। ২০১২ সালে রাস্তা পাকা হওয়ার আগে কোন রোগীকে ডাক্তারের কাছে যেতে হলে মানুষে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হতো, বিশেষ করে বর্ষার সময়।

এই গ্রামে দুইটি মুদি দোকান রয়েছে যা স্থাপিত হয় আজ থেকে সাত বছর আগে। গ্রামের প্রায় সব মানুষই ৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বাঁশতলা বাজার থেকে তাদের দৈনন্দিন বাজার করে এই গ্রামে কোনরকম মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট কিংবা বিকাশ, নগদের দোকান দেখিনি। বাঁশতলা বাজারে তিনটি ব্যাংকিং এজেন্ট এবং দুইটি ব্যাংক রয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্টগুলো হল ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক এবং ডাচ-বাংলা ব্যাংক এজেন্ট।

গ্রামটি পুরোপুরি কৃষিপ্রধান। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেসব জেলাগুলোতে যাওয়া হয়, যশোর, খুলনা, বরিশাল, শরিয়তপুর, ময়মনসিংহ ইত্যাদি। নারীরা খুব কমই নিজ গ্রামের বাহিরে গিয়ে কাজ করে। গোবিন্দকাটি গ্রামে অভিবাসন বলতে নিজ গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে, নিজ জেলা থেকে অন্য জেলাতে কিংবা অবৈধভাবে ভারতে গিয়ে কাজ করা, এর বাহিরে তারা কোথাও শ্রমিক ভিসা নিয়ে কাজ করতে যায় না।

গোবিন্দকাঠি গ্রামে তিনটি পাকা রাস্তা রয়েছে। একটি বিষ্ণুপুর থেকে হাটখোলা বা কাকশিয়ালী নদী পর্যন্ত। দ্বিতীয়টি গ্রামের পশ্চিম সীমানা দিয়ে গ্রামের মানুষের চলাচলের জন্য, তৃতীয়টি হচ্ছে ওয়াপদা রোড যেটা দিয়ে তারা খুলনা, সাতক্ষীরা ও কালীগঞ্জসহ বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারে। এছাড়া গ্রামের ভিতরেও ৩টি রোড আছে, যেগুলো সরকারিভাবে ইটের রাস্তা করে দেয়া হয়েছে মানুষের চলাচলের সুবিধার্থে।

গোবিন্দকাঠি গ্রাম পুরোটাই সমতল। তবে জমি চাষের ক্ষেত্রে কৃষকরা কৃত্রিমভাবে জলাভূমি তৈরি করে মাছ চাষ করে। অর্থকরী ফসল হিসেবে মাছই প্রধান। গোবিন্দকাঠি গ্রাম থেকে কৃষি ইনপুটের সেন্টার (সার, বীজ, কীটনাশকে দোকান) গুলো প্রায় সাড়ে ৫ কিলোমিটার দূরে বাঁশতলা বাজারে অবস্থিত।

ধান চাষের সময় যেভাবে গরু পালন করতো মাছচাষ আসার পর, সেরকম গরু পালন নাই গোবিন্দকাঠি গ্রামে। মোট ১৪টি পরিবার এখনো গরু পালন করেন। এক সময় গোবিন্দকাঠি গ্রামকে পোল্ট্রি গ্রাম বলা হতো। করোনার পর গ্রামে মাত্র ৮টি মুরগির খামার চালু আছে। যেহেতু লবণাক্ততার কারণে বছরে একবারই অর্থাৎ বর্ষাকালেই ধান করা যেত। অন্যসময়ে ধান চাষ করা সম্ভব হতো। ১৯৯৫ সালের দিকে গ্রামবাসী মাছ চাষের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। তারই ধারাবাহিকতায় এখন পুরো গ্রাম মাছের ঘেরে ঢেকে আছে।

২০০৩ সালের পর এখন পর্যন্ত এ গ্রামে ২টি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছে গ্রামবাসী। সরকারিভাবে ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ ২০১১ সালের পর এই গ্রামে আসে। সরকারী সেই ঋণপ্রকল্প এখন প্রায় বন্ধ। গোবিন্দকাঠি গ্রামে কোনো ধরনের সাইক্লোন আশ্রয়কেন্দ্র নেই। উচ্চ বিদ্যালয় ভবনকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

তথ্যসূত্র

Clandinin, D. J., and Caine, V. (2013). Narrative inquiry. *In Reviewing qualitative research in the social sciences* (pp. 166–179). Routledge.

Malek, M. A., Kikkawa, A., Azad, A. K., and Sawada, Y. (2022). *Rural development in Bangladesh over four decades: Findings from Mahabub Hossain Panel Data and the way forward* (No. 1350). ADBI Working Paper.

World Bank. (n.d.). World development indicators.

UNDP. (2023). Human development report, 2023–24.

World Bank. (2013). Bangladesh poverty assessment: A decade of progress in reducing poverty, 2000–2010.

World Bank. (n.d.). Bangladesh overview.

পার্থ সাহা, রঞ্জন (২০২৪), একুশ শতকের গ্রাম ও কৃষক সমাজ, *দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড*, ঢাকা।

মাহবুব হোসেন ও আবদুল বায়েস (২০১৫), বিশ গেরামের গল্প, *দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড*, ঢাকা।

BRAC Institute of Governance and Development (BIGD) is a prominent Southern social science research and academic institute. BIGD is a part of Brac University—a leading Bangladeshi private university with a historically strong social commitment. We conduct rigorous, multi-method social science research, grounded in developing country operations, on a range of social and economic issues to promote practical, time-sensitive innovations for tackling governance and development challenges.

bigd.bracu.ac.bd

BIGDBRACUniversity

BIGD-BRACU

BIGD-BracUniversity

Design: Md. Abdur Razzaque